জীবনী-বিচিত্রা

যাঁদের কর্মে ও জ্ঞানে মানুষ বড়ো
হয়েছে তাঁদের জীবন ও সাধনার কথা

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

স্বাক্ষর
১১বি, চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা-২০

প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫৫

প্রকাশক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বাক্ষর লিমিটেড, ১১বি চৌরঙ্গি টেরাস, কলকাতা ২০ ॥ মুদ্রাকর নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপ্না প্রেস লিমিটেড, ৮বি লালবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ১ ॥

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী



ভলতেয়ার

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জীবনী-বিচিত্রার দ্বিতীয় বই

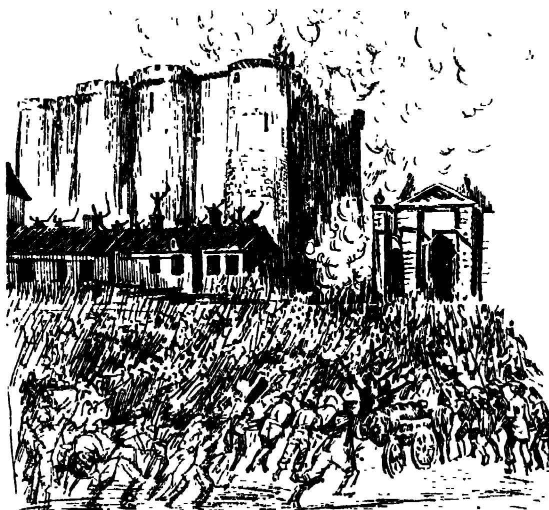
"ভোলতেয়ারের নাম করা মানেই পুরো অষ্টাদশ শতাব্দীর একটা বর্ণনা দেওয়া"

—ভিক্টর হুগো

লেখকের নিবেদন

ভোলতেয়ারের এই জীবন-চরিতটির জন্যে প্রধানতই উইল ডুরাণ্ড-এর রচনার উপর নির্ভর করেছি। তাই শুরুতেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ফরাসী উচ্চারণ বাংলা হরফে লিখলে ভোলতেয়ার লেখাই ভালো। ইংরেজীতে Voltaire লেখা হয়— ইংরেজী শিক্ষায় অভ্যস্ত বলেই আমরা চলতিভাবে ভল্‌টেয়ার বলে থাকি। মলাটের উপর সেই উচ্চারণই রাখা হলো, নইলে নামটা খুব অপরিচিত শোনাতো।



১৪ই জুলাই : বাস্তিলের পতন

আজ যদি আমরা ফরাসী-দেশে যাই তাহলে দেখবো, ১৪ই জুলাই তারিখে সেখানে এক মস্ত বড়ো উৎসবের আয়োজন চলেছে।

কিসের উৎসব? ১৪ই জুলাই কেন? কী হয়েছিলো এই তারিখটিতে?

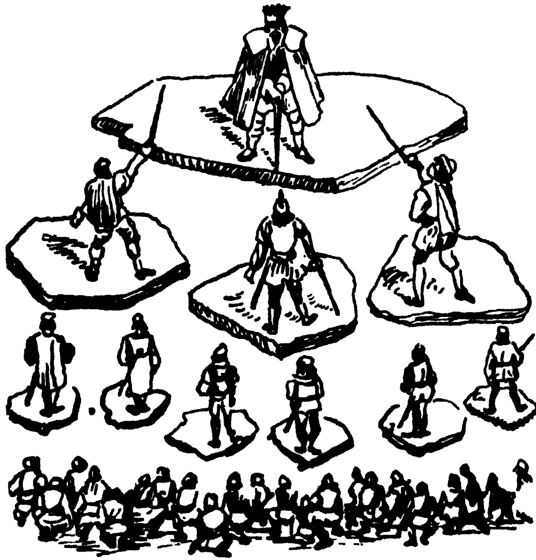
এক

সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। ১৭৮৯। তার মানে, প্রায় এক-শো ছেষট্টি বছর হতে চললো।

ও-দেশের রাজধানী প্যারিস শহরে একটা মস্ত দুর্গ ছিলো। তার নাম বাস্তিল। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই দুর্গটির পতন হয়।

দেশের একটা দুর্গর পতনের তারিখকেই দেশের মানুষ জাতীয় উৎসবের দিন বলে বেছেছে! তার থেকেই বোঝা যায়, দেশের লোক দুর্গটাকে মোটেই সুনজরে দেখে নি। কী করেই বা দেখবে? দুর্গ হলেও সেটাকে ব্যবহার করা হতো কয়েদখানা হিসেবে। দেশে তখন সামন্ত-শাসন। রাজরাজড়া, জমিদার আর পাদ্রি-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে টুঁ-শব্দটি করবারও জো নেই। যেই কিনা সে-চেষ্টা করতে গিয়েছে তারই টুঁটি টিপে ওই বাস্তিল দুর্গে পুরে দেওয়া হয়েছে।

এ-শাসনের ভিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেঁপে উঠলো, ভেঙে পড়লো। ইতিহাসের বইতে তাকেই বলে ফরাসী-বিপ্লব। ফরাসী-বিপ্লবের সময় খ্যাপা মানুষের দল চড়াও করলো বাস্তিল দুর্গ। পতন হলো দুর্গটার। তাই দুর্গ-পতনের তারিখটি দেশের লোকের কাছে আজো স্মরণীয়। জাতীয় উৎসবের দিন।



সামন্ত-শাসন : সব উপরে মহারাজ, আর তার তাঁবে ছোটবড়ো সামন্ত আর জমিদার

ফরাসী-দেশে গেলে আমরা আজো এ-উৎসব দেখতে পাবো। কিন্তু দুর্গটার চিহ্ন আমাদের চোখে পড়বে না। কেননা দেশের মানুষেরা সেটাকে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। তার বদলে সেখানে গড়েছে একটি স্মৃতি-স্তম্ভ—ফরাসী-বিপ্লবের শহীদ-দের স্মরণে।

আমরা নিশ্চয়ই এই স্মৃতি-স্তম্ভের গোড়ায় কিছু ফুল রেখে আসবো।

দুই

কিন্তু বলতে তো বসেছিলাম, ভোলতেয়ারের জীবনী। শুরুতেই এক কয়েদখানার কাহিনী কেন?

কেননা, বাস্তিলের কথা বাদ দিয়ে ভোলতেয়ারের জীবনকে যে বুঝতেই পারা যায় না।

কেন যায় না?

বাস্তিলের পতন : এই দুটি কথা কানে এলেই চোখের সামনে ফুটে ওঠে ফরাসী-বিপ্লবের ছবিটা। সামন্ত-শাসনের অবসান হচ্ছে, জেগে উঠছে নতুন সভ্যতা। ধর্মমোহের আঙিনা ছেড়ে মানুষেরা বেরিয়ে আসছে বিজ্ঞানের বিজয়পতাকা হাতে। মাথা তুলছে বণিক-ব্যাবসাদারের দল। দেশের শাসন তাদের হাতে আসছে। মান্ধাতার আমলের তাঁত-হাপর ফেলে দিয়ে দেশটা সরগরম হয়ে উঠবে কলকারখানায়। সে-এক প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড যুগ-বদলের কাহিনী। তারই প্রতীক হলো বাস্তিলের পতন।

আর এই যুগ-বদলের কাহিনীই ভোলতেয়ারকে বোঝবার একমাত্র সূত্র।

আরো একটা মজার কথা বলি।

সত্যি বলতে, ভোলতেয়ার নামটা মোটেই তাঁর আসল নাম

নয়। আসল নাম বুঝি ফ্রাসোয়া মারি আরুয়ে। ভোলতেয়ার হলো ছদ্মনাম। অথচ, আসল নামে কেই বা তাঁকে চেনে? ছদ্মনামেই তাঁর আসল পরিচয়। আর মজার কথাটা এই যে বাস্তিল বলে কয়েদখানায় বসেই তিনি ওই ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন।

তার মানে, ভোলতেয়ারের জেল হয়েছিলো।

প্রথম যখন জেল হয় তখন তাঁর বয়েস খুব বেশি নয়। মাত্র বছর তেইশ হবে। সেবারেই তিনি ছদ্মনামটা গ্রহণ করেছিলেন।

বাস্তিলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক জীবনে শুধু ওই একবারই নয়।

আর শুধু জেলই বা কেন? নির্বাসনও। তাও একবার নয়, আধবার নয়, বারবার।

আর শুধু নির্বাসনও নয়। তাঁর লেখা বই আগুনে পোড়ানো হয়েছে, বেআইনি করা হয়েছে। এসবও যে কতোবার, তার হিসেব করতে করতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

অথচ, ফরাসী দেশের কতো বড়ো গৌরব ওই ভোলতেয়ার!

ফরাসী সাহিত্যের কী আশ্চর্য সম্পদ তাঁর লেখা ওই বইগুলি!

শুধু ফরাসী-দেশের কথাই বা কেন? সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই এতো বড়ো লেখক খুব কম।

তবু কী নির্যাতন! কী হিংস্র আক্রমণ তাঁর ওই বইগুলির উপর!

এদিকে আবার, ভোলতেয়ারের লেখা বইগুলো পড়তে বসলে হাসতে হাসতে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কেবল, এ-হাসি শুধুই হাসির ব্যাপার নয়। সে-হাসি সেকালের শাসকদের বুক ভয়ে হিম করে দিতো। তাইতো তারা অতো ভয় পেতো ভোলতেয়ারের লেখনীকে। লেখনী তো নয়, যেন তলোয়ার। আর কী ধার সে-তলোয়ারের। তার আঘাতে রাজশক্তির বিরাট দম্ভও একেবারে খান-খান হয়ে যায়।

ছু-একটা গল্প বলি।

ফরাসী বিপ্লবের পর রাজা ষোড়শ লুই বন্দী হয়েছিলেন। বন্দীশালায় একদিন নাকি তিনি ভোলতেয়ারের (আর রুসো বলে সে-সময়কার আর একজন লেখকের) বইগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, এই ছুটো লোকই ফরাসী-দেশকে উচ্ছন্নে পাঠিয়েছে !

এখানে ফরাসী-দেশ মানে, নিশ্চয়ই তাঁর নিজের শাসন।

কিন্তু সত্যিই কি ছুজনের লেখা বই একটা দেশে বিপ্লব ঘটাতে পারে ? এটা অবশ্যই বাড়াবাড়ি কথা। শুধুই বইএর দরুন বিপ্লব হয় না। ফরাসী-বিপ্লবের অনেক কারণ ছিলো। তবু রাজার ওই আতঙ্কটাকেও তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সাহিত্যের শক্তি, সাহিত্যিকের শক্তি সত্যিই তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ভোলতেয়ারের রচনা দেশের মানুষের মনকে ফরাসী-বিপ্লবের জন্যে অনেকখানিই প্রস্তুত করেছিলো।

স্বয়ং নেপোলিয়নও নাকি একবার বলেছিলেন, সে-সময়ের

রাজারা যদি লেখার সরঞ্জামকে ঠিকমতো সায়েস্তা রাখতে পারতেন তাহলে তাঁদের রাজত্বের মেয়াদ বাড়তো।

কথাটা ঠিক। কেবল রাজারা যে সে-চেষ্টা করেন নি তা ঠিক নয়। নইলে ভোলতেয়ারের উপর এতোবার এতো আক্রমণ এসে পড়বে কেন ?

তিন

ভোলতেয়ারের জন্ম ১৬৯৪-এ।

আঁতুড়ঘরেই মা মারা গেলেন। ভোলতেয়ারের শরীরটাও প্যাঁকাঠির মতো। দাই বললো, এ-ছেলের মেয়াদ দিন দুয়েকের বেশি হবে না।

কিন্তু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ওই রুগ্ন দুর্বল শিশুটি সত্যিই বেঁচে রইলো। বড়ো হলো। এক-আধ বছর বেঁচে থাকা নয়। পুরো ৮৪ বছর।

১৭৭৮-এ তাঁর মৃত্যু হয়

চুরাশি বছরের এক সুদীর্ঘ জীবন। ভোলতেয়ারের শরীর-স্বাস্থ্য কোনোদিনই খুব ভালো যায় নি। কিন্তু কী অদম্য উৎসাহ! কাজ করবার কী অদ্ভুত শক্তি! তিনি নিরেনব্বইটি বই লিখে গিয়েছেন। প্রতিটি বইএর প্রতিটি পাতাই বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

কাজ। কাজ। কাজ।

ভোলতেয়ার অনেক কিছুই জানতেন, কেবল জানতেন না কাজ-না-করে কী করে বাঁচা যায়। তাঁর লেখা থেকে গোটাকতক

নমুনা তুললেই বুঝতে পারা যাবে তিনি কী রকম কাজ-পাগলা মানুষ ছিলেন।

—কাজ-না-করা আর বেঁচে-না-থাকা, দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই!

—পৃথিবীর সকলেই ভালোলোক, কেবল যারা কাজ করে না তারা বাদ।

—বয়েস যতোই বাড়ছে ততোই দেখছি জীবনের সবচেয়ে বড়ো সম্বল হলো কাজ, কাজে লেগে থাকা।

—যদি গলায় দড়ি দেবার লোভ সামলাতে চাও তাহলে যা-হোক একটা কাজ নিয়ে মেতে থাকো।

ভোলতেয়ারের কাছে, কাজ আর বাঁচা, একই কথা। কাজ-না-করা আর মরা, একই কথা।

এই কাজের ঘোরেই তিনি কাটিয়ে দিলেন পুরো জীবনটা। মানুষটা আর যাই পারুক না কেন, এক মুহূর্তও চুপ করে থাকতে পারতো না। চঞ্চল আর অস্থির তাঁর সারা জীবন।

এইখানে একটা কথা খুলে বলি। স্মরণীয় সব মানুষের জীবনই ছাঁচে-ঢালা এক রকমের নয়। কেউ বা শান্ত নির্লিপ্ত স্থির-ধীর—ধ্যানমগ্ন ঋষির ছবির মতো। কিন্তু ভোলতেয়ার সে-রকম ছিলেন না। চঞ্চল, অস্থির,—এমনকি অনেক সময়ে তাঁকে উদ্দাম মনে হয়।

আসলে, তাঁর যুগটাকে বাদ দিয়ে তো আর তাঁর জীবনকে বোঝবার জো নেই। বিপ্লব। বিপ্লবের যুগ। টলমল করে উঠেছে

পুরো দেশটা। এ-যুগের জীবন শান্ত নির্লিপ্ত হবে কেমন করে

এ-যুগে যে অনেককিছুই ভাঙা দরকার ছিলো—বাস্তিল বলে ওই দুর্গকে ভাঙা, আর যারা এ-দুর্গ ভাঙবে তাদের মন থেকে পুরোনো কালের সংস্কারগুলো ভাঙা। এমনি অনেক কিছুই। লেখক হিসেবে ভোলতেয়ারকেও ভাঙার কাজে মাততে হলো। বাস্তিলে তাঁকে বন্দী করেও যারা বাস্তিল ভাঙবে তাদের মনের ধর্মমোহ ভাঙবার কাজ থেকে ভোলতেয়ারকে নিরস্ত করা যায় নি।

চার

প্রথমবার বাস্তিল যাবার গল্প থেকেই শুরু করা যাক।

ভোলতেয়ারের বাবা ছিলেন বিলক্ষণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। ছেলেকে শুধোলেন, রুজি-রোজগারের ব্যাপারে কী সাব্যস্ত করছো? ছেলে বললো, লিখবো। শুনে তো বাবার পিত্তি জ্বলে গেলো। লিখবে? লেখা আবার জীবিকা হয় নাকি? লেখক হতে চাওয়া মানেই আত্মীয়-স্বজনের ওপর বোঝা হয়ে বাঁচতে চাওয়া। আর মরতে চাওয়া অনাহারে! জীবনে কী করে কী খেয়ে বাঁচতে চাও তাই বলো।

ছেলে বললো, লিখবো।

বাবা অনেক উপদেশ দিলেন। উপদেশে কোনো কাজ হলো না।

ছেলে পদ্য লিখে আড্ডা মেরে ঘুরে বেড়ায়। বাবার বন্ধুরা বলেন, ছেলেটি বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে দেখছি!

শেষ পর্যন্ত বাবা প্রায় হাল-ছেড়ে-দেবার ভাব করে ১৭১৫ সালে ভোলতেয়ারকে প্যারিস শহরে পাঠিয়ে দিলেন—সেখানে যদি ছেলেটার কোনো একটা হিল্লে হয়! প্যারিসে আসবার কিছুদিনের মধ্যেই বেপরোয়া আর ফাজিল ছোকরা হিসেবে তাঁর কিছুটা নামডাকও হয়ে গেলো।

তখন ওখানে খুব গোলমাল চলেছে। রাজা চতুর্দশ লুই মারা গিয়েছেন। রাজপুত্র নাবালক। দেশ-শাসনের আসল দায়িত্বটা যাঁর ওপর তাঁকে বলা হতো রিজেন্ট—রাজপ্রতিনিধি।

একবার হলো কি, রিজেন্ট ঠিক করলেন, রাজ-আস্তাবল থেকে অর্ধেকগুলো ঘোড়া বিক্রি করে কিছুটা রাজখরচার সাশ্রয় করা যাক। ছোকরা আরুয়ে—কেননা তখনো তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন নি—টিপ্পনী কেটে পদ্য লিখলেন: এর বদলে রাজসভা থেকে অর্ধেকগুলি গাধাকে বিদায় করলেই বেশি বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হতো না কি?

রিজেন্ট স্বভাবতই পদ্যটা পড়ে খুশি হন নি।

একদিন এক পার্কে তিনি এই তরুণ কবিটির সাক্ষাৎ পেলেন। বললেন, ছোকরা তো বেশ লায়েকের মতো লিখতে পারো দেখছি! তোমাকে এমন একটি জায়গা দেখতে পাঠাবো যা দেখবার সৌভাগ্য আগে কখনো পাও নি।

ধন্যবাদ। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?

বাস্তিল দুর্গের মধ্যে।

পরদিন আমাদের তরুণ কবিকে নতুন জায়গাটি দেখতে যেতে হলো।

জেলে গিয়ে ভোলতেয়ার কী করলেন? বিরস বদনে বসে রইলেন নাকি? মোটেই নয়। চুপচাপ বসে থাকবার পাত্রই নন। ওই জেলখানায় বসে-বসেই তিনি রচনা করলেন তাঁর জীবনের প্রথম বড়ো কাব্যগ্রন্থ।

কয়েদখানাও কাব্যচর্চার জায়গা হয়ে দাঁড়ালো !

রিজেণ্ট কিন্তু কাব্যগ্রন্থটি পড়ে খুশিই হয়ে গেলেন। তার মধ্যে ঝাঁঝালো বিদ্রূপ ছিলো না। কবিত্ব ছিলো। রিজেণ্ট ভাবলেন, ছোকরা আসলে নিরীহ ধরনেরই লোক। ওর রসিকতায় অমনভাবে চটে না গেলেই হয়তো ভালো হতো।

ফলে, ভোলতেয়ার শুধুই যে কয়েদ থেকে ছাড়া পেলেন তাই নয়, খেসারত হিসেবে সামান্য কিছু জলপানির টাকাও।

টাকা পেয়ে ভোলতেয়ার রিজেণ্টকে লিখলেন, পেট চালাবার এই ব্যবস্থাটি করবার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা নিয়ে দয়া করে আর মাথা ঘামাবেন না। ওটুকুর ভার আমার উপরেই ছেড়ে দিন।

জেল থেকে বেরিয়ে ভোলতেয়ার একটি নাটক লিখলেন। নাটকটার দরুন দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেলো। পঁয়তাল্লিশ রাত ধরে তার অভিনয় চললো। প্যারিস শহরে রেকর্ড।

শোনা যায়, ভোলতেয়ারের বাবাও নাকি নাটকটা দেখতে এলেন আর দেখতে-দেখতে বারবার তিনি উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, হতভাগাটা তো অদ্ভুত লিখেছে, হতভাগাটা তো সত্যিই অদ্ভুত লিখেছে !

আসল কথা, ছেলেকে তিনি একেবারে বুঝতেই পারেন নি। তিনি তো ভাবতেন ছেলেটা গোল্লায় গিয়েছে, কেননা তার একচুলও বিষয়বুদ্ধি গজায় নি। কিন্তু আসলে তা নয়। ভোলতেয়ারের বিষয়বুদ্ধিও খুব কম ছিলো না। বরং আমাদের

কাছে ভোলতেয়ারের চরিত্রের এই দিকটা খুবই অদ্ভুত মনে হয়। কেননা আমরা সাধারণত ভাবি কবি-সাহিত্যিক সুন্দরের পূজারী, কল্পনার জগৎ নিয়েই বিভোর। তাই টাকাকড়ির ব্যাপারে তাঁর পক্ষে উদাসীন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ভোলতেয়ার ছিলেন অন্য রকমের মানুষ। টাকাকড়ির ব্যাপারে উদাসীন তো ননই, এমন কি এদিক থেকে তাঁকে ধূর্ত ব্যাবসাদারের মতোই মনে হয়।

এ-রকম অদ্ভুত ব্যাপার কেন?

আবার সেই একই কথা। তাঁর যুগটাকে বাদ দিয়ে তাঁর জীবনকে বোঝা যায় না। যুগটা কী রকম? বিপ্লবের যুগ, যুগ-বদলের যুগ। একদিকে সামন্ত-পুরোহিতদের শাসনের অবসান হচ্ছে, আর একদিকে উত্থান হচ্ছে বণিক-ব্যাবসাদারদের। ভোলতেয়ারের লেখায় আর ভোলতেয়ারের জীবনেও এই দুটো দিকেরই পরিচয়। একদিকে সামন্ত-পুরোহিতদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ আর একদিকে বণিক-ব্যাবসায়ীদের মতোই ধূর্ত বিষয়-বুদ্ধি।

তাঁর এই প্রথম নাটকটার কথাই ধরা যাক। এই নাটকটির প্রসঙ্গেই তাঁর চরিত্রের ওই দুটি দিকের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে।

পাদ্রি-পুরোহিতদের উপর আক্রমণটা কী রকম?

নাটকের এক জায়গায় তিনি লিখছেন:

সরল মানুষেরা যা ভাবে পুরোহিতেরা তা নয়
ওদের জ্ঞান মানে আমাদেরই মূঢ়তা

কিংবা

তাহলে এসো, নিজেদেরই বিশ্বাস করি, নির্ভর করি নিজেদেরই চোখজোড়ার উপর—এই হোক দৈববাণী, যন্ত্রমন্ত্র ঈশ্বর আমাদের।

ধর্মবিশ্বাস নিয়ে সেকালের সঙ্গে একালের অনেক তফাত হয়েছে। তাই এমনতরো কথা শুনে আজকের মানুষ হয়তো স্তম্ভিত হয় না। কিন্তু ভোলতেয়ারের সময়ে দিনকাল অন্য রকমের ছিলো। মানুষ সত্যিই চমকে উঠতো এ-সব কথা শুনলে: পুরোহিতদের বিদ্বান মনে করাটা মূঢ়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাসের চেয়ে নিজের চোখ-জোড়াকে বিশ্বাস করা ঢের বড়ো কথা—

আর ভোলতেয়ার কি না এই সব কথা লিখছেন এমন এক যুগে যখন রাজশক্তির সঙ্গে পুরোহিতদের শক্তি জোট পাকিয়ে রয়েছে!

এমনতরো পাষণ্ডের মতো লেখার দরুন ভোলতেয়ারের নিশ্চয়ই আবার জেল হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, এ-যাত্রা তিনি বেঁচে গেলেন। জেলের বদলে, ওই নাটকের লেখক হিসেবে তাঁর রোজগার হলো চার হাজার ফ্রাঁ।

অনেক টাকা।

টাকাটা নিয়ে ভোলতেয়ার কী করলেন? সেই গল্পই বলি। গল্পটা শুনলেই বোঝা যাবে, ব্যাবসাদারী বুদ্ধিতেও মানুষটি তেমন খাটো ছিলেন না।

ফরাসী সরকারের তরফ থেকে তখন একটা লটারির আয়োজন হয়। আয়োজনটার মধ্যে একটুখানি বেকুবির পরিচয় ছিলো। টিকিট ছাপানো হলো কম, অথচ পুরস্কারের অঙ্কটা ঘোষণা করা হলো মস্ত অনেকখানি। এ-যেন সরকারি বদান্যতা—সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেলেও যে-টুকু টাকা পাওয়া যাবে, পুরস্কার দেওয়া হবে তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা।

বদান্যতা দেখে সাধারণ লোক খুশি হবে না?

খুশি হলেন ভোলতেয়ার। তিনি করলেন কি, নাটকের সবটুকু রোজগার দিয়ে সব-টিকিট একাই কিনে ফেললেন।

বোকা বনে গিয়ে সরকারি কর্তারা তো রেগে আগুন। কিন্তু পুরস্কারের টাকা না দিয়ে আর উপায় কি? ভোলতেয়ার দেদার টাকা পেয়ে গেলেন। আর দেদার টাকা পেয়ে গিয়ে ভোলতেয়ার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ভূরি-ভোজ আর সাহিত্যিক আড্ডা জমাতে শুরু করলেন।

ভোলতেয়ারের চরিত্রের এও একটা দিক।

স্মরণীয় মানুষদের কথা পাড়বার সময় আমাদের মধ্যে কখনো কখনো একটা ভুল ঝোঁক এসে যায়। আমরা ভুলে যেতে বসি যে

স্মরণীয় হলেও লোকটি রক্তমাংসে গড়া মানুষই ছিলেন। অর্থাৎ স্মরণীয়দের মধ্যে সকলেই যে সব দিক থেকে আমাদের কল্পনা-করা কোনো একরকম আদর্শ মহাপুরুষের মতো হবেন তার কোনো মানে নেই। তাই, কোনো স্মরণীয় মানুষের কথা আলোচনা করবার সময় আমাদের পক্ষে প্রধানত এই কথাটি ভালো করে বোঝা দরকার, ঠিক কোন কারণে তিনি স্মরণীয় ছিলেন। সব দিকে থেকে সব রকমের মহত্ত্ব প্রত্যেকের মধ্যে আশা করা ঠিক নয়।

পাঁচ

ভোলতেয়ারের দ্বিতীয় নাটকটা কিন্তু ওতরালো না। তার ওপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বসন্ত রোগে পড়লেন। অনেকদিন ভুগলেন।

সেরে উঠে বাইরে বেরিয়ে তিনি তো অবাক! ইতিমধ্যে তাঁর সেই জেলে-বসে-লেখা কাব্যগ্রন্থটির দরুন" প্যারিস শহরে তিনি দারুণ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন। সকলেই,—মানে বড়োলোকেরাও, সম্ভ্রান্তরাও,—কবিতা নিয়ে আলোচনা করছে। তাঁর কবিতা।

আভিজাতিকদের আসরে তাঁর ডাক পড়তে লাগলো। নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ। ভোলতেয়ারকে নিমন্ত্রণ করাটাই যেন এক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। সবাই বলে, কী প্রতিভাবান কবি! কী আশ্চর্য লেখা-পড়া-জানা মানুষ। রুচি কী পরিচ্ছন্ন! মানুষটার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে পাওয়াও যেন সৌভাগ্যের বিষয়!

আর সত্যি বলতে, ভোলতেয়ারের মতো অতো ভালো করে কথা-বলবার কায়দা আর কারুরই ছিলো কিনা সন্দেহ! তাঁর মুখের কথা ছিলো তাঁর কলমের লেখার মতোই ধারালো।

কিন্তু এহেন একজন বংশ-পরিচয়ের গরিমা-হীন সাধারণ

লোকের ছেলে সমাজের উঁচু মহলে এতোখানি প্রশ্রয় পাবে? আভিজাতিকদের মধ্যে কারুর কারুর কাছে ব্যাপারটা নেহাতই দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ালো।

একদিন রাতে এক খুব মস্ত ধনী লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিলো। ভোলতেয়ার গিয়েছেন। সোভালিয়ে দ্য রোয়াঁ বলে একজন অতি-বড়ো আভিজাতিক ভদ্রলোকও গিয়েছেন। ভোলতেয়ার নানা রকমের কথা বলছেন, পাঁচজনে মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সোভালিয়ে কিন্তু বিলক্ষণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন—বংশগৌরবহীন একটা লোকের পক্ষে এ-রকম বড়োলোকদের মধ্যে আসাই উচিত নয়। আর যদিই বা আসে তাহলেও বিনীতভাবে মুখ বুজে এক-কোণে বসে থাকা উচিত।

ভোলতেয়ারকে অপমান করবার জন্যেই সোভালিয়ে বললেন, ওই যে ছোকরা একটু উঁচু গলায় কথা বলছে—ওর নাম কি?

ভোলতেয়ার তো রেগে আগুন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে বললেন, আজ্ঞে খুব একটা বড়ো বংশের নামের বোঝা কাঁধে করে সে ঘোরে না, তার বদলে তার নিজের যা নাম তারও খাতির কম নয়।

সোভালিয়ের মতো ধনী লোক! তাঁর কথার জবাব দেওয়াই বেয়াদপি! আর ভোলতেয়ার কিনা একেবারে চোপা করে বসলেন!

দাঁতের ওপর দাঁত চেপে উঠে গেলেন সোভালিয়ে।

রাতে বাড়ি ফেরবার পথে ভোলতেয়ারকে ঘেরাও করলো গুণ্ডার দল। সোভালিয়ের পকেট থেকে এক চিমটে পয়সা পাবার লোভে অমন অনেক গুণ্ডা লালায়িত হয়ে থাকতো।

পরের দিন দেখা গেলো, ভোলতেয়ারের আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন। কিন্তু রাগে যেন অন্ধ।

কোথায় চললেন ভোলতেয়ার?

সোভালিয়ে বসে বসে থিয়েটার দেখছিলেন। ভোলতেয়ার একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির।

বললেন, কাপুরুষের মতো গুণ্ডা লাগানো! সাহস থাকে চলে এসো—সরাসরি ডুয়েল লড়ে যাই।

দুজনে দুখানা খোলা তলোয়ার হাতে মুখোমুখি দাঁড়াবে নাকি?

কিন্তু সোভালিয়ের টাকার জোর যতোই থাকুক না কেন, মনের জোর অতো ছিলো না।

ভয় পেয়ে তিনি ভাই-এর বাড়ি ছুটলেন। ভাই ছিলেন, পুলিস-মন্ত্রী। সোভালিয়ে বললেন, বাঁচাও আমাকে।

পরের দিন ভোলতেয়ারকে আবার সেই পুরোনো আবাস বাস্তিলে যেতে হলো।

যাকে বলে মগের মুলুক। গুণ্ডা লাগিয়ে জখম করলো সোভালিয়ে আর জেল হলো কিনা ভোলতেয়ার-এর!

বাস্তিল থেকে বেরুনো যাবে কী করে?

কর্তারা বললেন, নির্বাসন মেনে নিলে। অর্থাৎ কিনা, ভোলতেয়ার যদি সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-দেশ ছেড়ে যেতে রাজি হন।

ভোলতেয়ার বললেন, তাই সই।

সত্যিই কি তিনি অতো সহজে নির্বাসন-দণ্ডটাকে স্বীকার করতে চাইলেন নাকি? আসলে তা নয়। একটা মতলব

ছিলো। পেয়াদারা তো তাঁকে খাল পার করে ইংল্যাণ্ডে ছেড়ে দিয়ে খালাস। আর ভোলতেয়ার করলেন কি, ফিরতি জাহাজে ছদ্মবেশে ফরাসী-দেশেই ফিরে এলেন।

তাঁর মনে তখন শুধু একটা কথা, প্রতিশোধ নিতে হবে।

কিন্তু পুলিসের গুপ্তচরেরা খবর পেয়ে গেলো। আর, খবর পেয়ে গেলেন ভোলতেয়ারের বন্ধুরাও। তাঁরা হাঁফাতে হাঁফাতে ভোলতেয়ারের কাছে হাজির: পালাও, পালাও,—অ্যারেস্ট করবার জন্যে পুলিসের দল এলো বলে।

আবার বাস্তিল নাকি?

নাঃ, বাস্তিল দেখা ঢের হয়েছে। ভোলতেয়ারের আর সে-শখ নেই।

গজরাতে গজরাতে তিনি আবার জাহাজে উঠে পড়লেন।

ছয়

এরপর ইংল্যাণ্ডে তিন বছর। ১৭২৬ থেকে ১৭২৯।

প্রথমটায় ইংরেজী ভাষার রকম-সকম দেখে ভোলতেয়ার তো স্তম্ভিত। প্লেগ বা plague নাকি একটা সিলেব্‌ল্ আর এগু বা ague হলো দু-সিলেব্‌ল্। দুটোই রোগের নাম। ভোলতেয়ার বললেন, জাহান্নমে যাক এই ভাষা—অর্ধেক যাক প্লেগে, আর বাকি অর্ধেক এগুতে।

অবশ্যই, এই কিম্ভূতকিমাকার ভাষাটিকেও রপ্ত করতে ভোলতেয়ারের মতো লেখকের পক্ষে সত্যিই খুব বেশিদিন লাগবার কথা নয়। আর সত্যি বলতে, তা লাগেও নি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যে শুধু ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন তাই নয়, ইংরেজী সাহিত্যেও।

আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই পরিচয় নয়, তখনকার ইংরেজ সাহিত্যিকদের সঙ্গেও নানারকম ঘনিষ্ঠতা।

আর অবাক হয়ে গেলেন ভোলতেয়ার।

অবাক কেন? কী দেখে?

ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া দেখে—চিন্তাজগতের আবহাওয়া। ভোলতেয়ারের মনে হলো, ফ্রান্সের সঙ্গে এ-যেন আকাশ-পাতাল

তফাত। মানুষ এখানে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, স্বাধীন ভাবে নিজেদের চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পারে। সত্যের বিরুদ্ধে বাধা নেই,—জ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়।

এক কথায়, বাস্তিল নেই।

ফ্রান্সে? অকর্মণ্য একদল লোকের মর্জিমাফিক কথা না বললে পেয়াদা এসে টুঁটি টিপে ধরবে। কেননা, ওদের নাম আভিজাতিক মানুষ। একদল ধূর্ত প্রতারকদের মন জুগিয়ে কথা না বললেই কয়েদখানায় যেতে হবে। কেননা, তাদের নাম পাদ্রি আর পুরোহিত।

ইংল্যাণ্ডে? ওরকম নয়। চোখে-দেখার বিরুদ্ধে চোখ-রাঙানি নেই, বুদ্ধি-বিবেকের বিরুদ্ধে নেই বাস্তিল দুর্গ। জ্ঞানীরা খোলা-খুলি ভাবেই জ্ঞানের কথা প্রকাশ করছেন, বৈজ্ঞানিকেরা চোখে-দেখার উপর আর বিচার-বিবেকের উপর নির্ভর করেই সত্য আবিষ্কারের কাজে উঠে-পড়ে লেগেছেন। হুমকির ভয় নেই। ফ্রান্সের মতো নয়।

কেন নয়? তার কারণ কি এই যে ইংরেজ জাতটাই খুব ভালো? ইংল্যাণ্ড দেশটাই খুব ভালো?

আসল কথাটা হলো অন্য। কিছুকাল আগেও ইংল্যাণ্ডের অবস্থা মোটের উপর ফ্রান্সের মতোই ছিলো। সেই সামন্তদেরই শাসন, সেই রাজা-রাজড়া আর পাদ্রি-পুরোহিতদের দোর্দণ্ড প্রতাপ! কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ইতিমধ্যে একের পর এক বড়ো ঘটনা ঘটে গিয়েছে—১৬৪৯-এ মহারাজ চার্লস্‌-এর মাথা ধুলোয়

লুটিয়েছে, ১৬৮৮-এ ঘটেছে ইংরেজ-বিদ্রোহ। এ-সব ঘটনার ফলে দেশ থেকে রাজশক্তি যে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে তা নিশ্চয়ই ঠিক কথা নয়, দেশের শাসন-ভার সত্যিই পুরোপুরিভাবে দেশের সাধারণ লোকের হাতে এসে পড়েনি। তবুও তফাত হয়েছিলো, আর সত্যি বলতে সে-তফাত নেহাত সামান্য নয়।

কী রকম তফাত? সামন্ত-শাসনের শিরদাঁড়াটা যেন ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিলো, বণিক-ব্যাবসায়ীদের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়াবার সম্ভাবনা অনেক ঘনিয়ে এসেছিলো। আর সেই বণিক-ব্যাবসাদারদেরই স্বার্থ হলো পৃথিবীকে বেশি করে জানা, ভালো করে জয় করা,—যাতে বড়ো বড়ো কলকারখানায় দেশটা জমজমাট হয়ে উঠতে পারে। এ-যুগের ইংল্যাণ্ডে তাই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বাধা শিথিল হয়ে আসছে, চিন্তার আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ অনেকটাই স্বাধীন হতে পারছে।

এক-কথায়, যে-বিপ্লবের জন্যে ভোলতেয়ার তাঁর নিজের দেশের মানুষের মনকে প্রস্তুত করবার আশায় অমনভাবে মেতে উঠেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের লোক ইতিমধ্যেই সে-বিপ্লবের দিকে বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে! এইভাবে দেশের মানুষের মনকে প্রস্তুত করতে গিয়ে ভোলতেয়ারকে তো কম নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি! তাই ইংল্যাণ্ডে গিয়ে অন্য আবহাওয়া দেখে তাঁর পক্ষে তো অবাক হবার কথাই!

ভোলতেয়ারের মনে হলো, নতুন যুগের নতুন চেতনায় দেশটা যেন দপ্‌দপ্‌ করছে! পোপ, এডিস্‌ন্‌ সুইফ্‌ট্‌—আরো অনেকে।

নিজেদের বিচার-বিবেক অনুসারে তাঁরাই লিখে চলেছেন—অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে পাইক-পেয়াদার উৎপাত নেই এ-দেশে। ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) রচনা নিয়ে এদেশে প্রকাশ্যেই মাতামাতি করা চলে, অথচ এই বেকন-এর মূল কথাটা হলো—বিজ্ঞানের সাহায্যেই মানুষের সবচেয়ে বড়ো মঙ্গল করা যায়। এদেশে হব্‌স্‌ (১৫৮৮-১৬৭৯) যে-রকম নাস্তিকতা আর জড়বাদ প্রচার করেছেন ফ্রান্সে তা করতে গেলে শহীদ হয়ে যেতে হতো। লক্‌ (১৬৩২-১৭০৪) সম্প্রতি মানুষের মন নিয়ে একটা বই লিখেছেন, তাতে ঈশ্বরের কথা নেই, অলৌকিক তত্ত্বের ছিটেফোঁটাও নেই—অথচ এ-হেন বই নিয়েই ইংল্যাণ্ডের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে কী রকম প্রকাশ্য উৎসাহ!

কিন্তু এঁদের সবাইকার কথা ছাড়িয়ে ইংল্যাণ্ডের যে-মানুষটি সম্বন্ধে ভোলতেয়ারের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা হলো তাঁর নাম আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭)। নিউটনের নাম কে না জানে? অন্তত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর নামটার সঙ্গে আমরা সবাই সুপরিচিত। ভোলতেয়ার লিখছেন,

সেদিন একদল পণ্ডিত বসে বসে ছেলেমানুষদের মতো তর্ক শুরু করলেন, কাকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো মহাপুরুষ বলা যাবে—সিসার, আলেকজেণ্ডার, না ক্রমওয়েল? একজন বললেন, আইজাক নিউটন—এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না! আর সত্যিই তাই। আমরা শ্রদ্ধা করবো কাকে? যিনি সত্যের দীপ্তিতে আমাদের মনকে জয় করেছেন তাঁকে, না, যাঁরা গায়ের জোরে আমাদের গোলাম বানাতে চেয়েছিলেন তাঁদের?

সত্যের দীপ্তিতে নিউটন জয় করেছেন আমাদের মন। ভোলতেয়ারের মনে হলো, নিউটনই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।

দিনের পর দিন আর মাসের পর মাস ধরে ভোলতেয়ার একনিষ্ঠ ছাত্রের মতো নিউটনের লেখা পড়তে লাগলেন, তাই নিয়ে চিন্তা আর আলোচনা করতে লাগলেন। এর পর ফ্রান্সে ফিরে নিউটনের মতের সবচেয়ে বড়ো প্রচারক হয়ে দাঁড়ালেন ভোলতেয়ার।

সাহিত্যিক হলেও, বিজ্ঞানের প্রতি অসামান্য নিষ্ঠা ছিলো ভোলতেয়ারের। তার মানে, শুধুই যে তিনি মুখে বলতেন বিজ্ঞান ভালো—তাই নয়। তিনি নিজে বিজ্ঞান নিয়ে রীতিমতো চর্চা করতেন, আলোচনা করতেন। এমনকি গবেষণাও করতেন।

সাত

১৭২৯। রিজেন্ট ভাবলেন, তিন বছর নির্বাসনে থেকে লোকটার নিশ্চয়ই মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, এখন ওকে দেশে ফিরতে দিলে আর সোভালিয়ের মাথা কাটবার চেষ্টা করবে না।

ভোলতেয়ার অনুমতি পেলেন দেশে ফেরবার।

ভোলতেয়ার ফ্রান্সে ফিরলেন।

তারপর পাঁচ বছর ধরে প্যারিস শহরে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আগের মতোই আড্ডা, খাওয়া-দাওয়া আর সাহিত্যচর্চা। পাঁচটা বছর মোটের উপর নিরাপদেই কাটলো বলা যায়।

তারপর—সে-এক সাংঘাতিক ব্যাপার।

ইংল্যাণ্ডে থাকতে থাকতেই তিনি একটা বই লিখেছিলেন। বইটার নাম 'ইংল্যাণ্ডের চিঠি'।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ যে-রকম 'রাশিয়ার চিঠি'তে রাশিয়ায় তিনি যা-দেখেছিলেন আর তাই দেখে তাঁর যে-সব কথা মনে হয়েছিলো তাই লিখেছিলেন—ভোলতেয়ারের 'ইংল্যাণ্ডের চিঠি'ও অনেকটা সেইরকম বই। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' ইংরেজ-সরকারের মনঃপূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও-বইটা না লিখলেই ইংরেজ শাসকেরা খুশি হতো। এ-হলো একালের ব্যাপার :

একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রাশিয়ায় যা দেখে এলেন ইংল্যাণ্ডের শাসকেরা তার প্রচার সইতে পারে না। সেকালে আবার অন্য রকম : সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ইংল্যাণ্ডে যা দেখে এলেন তার প্রচার ফ্রান্সের শাসকেরা সইতে পারলো না।

ইংল্যাণ্ড তখন যে—বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়েছে ফ্রান্সের শাসকেরা সে-বিপ্লবকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করছে, আর রাশিয়ায় আজ যে-বিপ্লব ঘটেছে ইংল্যাণ্ডের শাসকেরা তাকে রোধ করতে চাইছে।

ফ্রান্সের শাসকেরা যে 'ইংল্যাণ্ডের চিঠি' সইতে পারবে না, ভোলতেয়ার তা জানতেন। কেননা তাঁর 'ইংল্যাণ্ডের চিঠি'তে তিনি ফ্রান্সের তখনকার আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার। আর সে-তুলনা তো আর খুব নিরীহ-মতো নয় : ভোলতেয়ারের লেখনীর সঙ্গে লেখার কাগজের স্পর্শ হলেই যেন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, আর তার আলোয় জ্বালা করে শাসকদের চোখ।

ভোলতেয়ার তাই ঠিক করেছিলেন, কাজ নেই বইটা ছাপিয়ে। ওটা ওই পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই থাক, দু-চারজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়তে দেওয়াই ভালো।

কিন্তু একটি ধূর্ত প্রকাশক যে-করেই হোক পাণ্ডুলিপির একটা কপি জোগাড় করে ফেললো। আর সে ভাবলো, বইটা ছাপিয়ে ফেলতে পারলে একেবারে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে যাবে—বহুত বিক্রি হবে, বহুত টাকা করে ফেলা যাবে।

ভোলতেয়ারকে একেবারে না-জানিয়েই সে বইটা প্রকাশ

করে বসলো।

ভোলতেয়ার যে ভোলতেয়ার—তিনিও এই কাণ্ড দেখে একেবারে স্তম্ভিত!

ফরাসী-দেশের লোকসভায় সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলো : বইটার সমস্ত কপি সংগ্রহ করে প্রকাশ্যভাবে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বইটা নির্লজ্জ, বিধর্মী, দুর্নীতিমূলক।

প্রকাশ্যে পোড়ানো হলো এই বই। আর—

ভোলতেয়ার খবর পেলেন আবার তাঁকে বাস্তিল পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অতএব, বেগতিক দেখে ভোলতেয়ার ঠিক করলেন, এ-অবস্থায় সবচেয়ে নিরাপদ কাজ হলো স্রেফ চম্পট দেওয়া।

আট

সিরে বলে একটি ছোট্টো নির্জন গ্রাম। কোলাহল-মুখর প্যারিস থেকে অনেক দূরে।

ভোলতেয়ার সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

সারাদিন ভোলতেয়ার কী করতেন ?

লিখতেন। বিজ্ঞানের গবেষণা করতেন। আর নাটক করতেন —নিজের লেখা নাটকে নিজে অভিনয় করতে ভোলতেয়ার দারুণ ভালোবাসতেন। এদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের মতোই। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে নিজের লেখা নাটকে নিজে অভিনয় করতে খুব ভালোবাসতেন। ভোলতেয়ার নিজের নাটক অভিনয় করবার জন্যে একটি ছোটোখাটো থিয়েটার বানিয়ে ফেললেন।

আর বিজ্ঞানের গবেষণা। নিউটন নিয়ে আলোচনা। শুধু বিজ্ঞানের বই পড়া নয়। নিজে হাতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবার জন্যে ভোলতেয়ার একটা গবেষণাগারও বানিয়ে ফেললেন।

আর লেখা। ভোলতেয়ারের সবচেয়ে ভালো সবচেয়ে নামকরা বইগুলির মধ্যে বেশির ভাগই এখানে বসে লেখা।

এদিকে ভোলতেয়ার প্যারিস ছাড়তে বাধ্য হলেও প্যারিস তো

সত্যিই তাঁকে ছাড়তে পারে না! কেমন করে পারবে? সে-যুগের সবচেয়ে বড়ো সাহিত্যিক, তখনকার ফ্রান্সের সবচেয়ে বড়ো চিন্তাশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানে অমন পারদর্শী—একটি মানুষের মধ্যে এতোরকম প্রতিভার সমন্বয় কি সহজ কথা নাকি? আর অমন অপরূপ ধারালো কথা তো কেউই বলতে পারতো না। ভোলতেয়ারের কাছে বসে দুদণ্ড তাঁর মুখের কথা শুনতে পাওয়াও এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

ফলে, প্যারিস থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্ধু-বান্ধব আর ভক্ত-মুগ্ধর দল এসে জমতে লাগলো ওই নির্জন গ্রামটিতেই।

অতিথি-অভ্যাগততে বাড়ি সবসময়েই সরগরম। অতিথি-অভ্যাগত বলতে তখনকার ফ্রান্সের যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা গুণী, যাঁরা সেরা।

ভোলতেয়ার এতো সময় পেতেন কী করে? এতো অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতেই তো একটা মানুষের সারা দিন কেটে যাবার কথা। তার উপর লেখা। গবেষণা। অভিনয়।

আসলে অতিথি-অভ্যাগতর দল প্রায় সারাটা দিনই ভোলতেয়ারের দেখা পেতো না। ভোলতেয়ার থাকতেন নিজের কাজ নিয়ে। সারা দিন। আর তারপর, সারাদিন একটানা কাজ করার পর, দিনের শেষে তিনি নিজেকে যেন ছেড়ে দিতেন বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে।

শেষ পর্যন্ত এই ছোট্ট নির্জন গ্রামটিই ফরাসী দেশের সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো। আমাদের দেশে একটা

সময়ে যে-রকম বীরভূমের একটি রুক্ষ নির্জন গ্রাম—শান্তিনিকেতন বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রবীন্দ্রনাথের কথা বারবার তুলছি। তার কারণ, ফ্রান্সের পক্ষে ভোলতেয়ার যে ঠিক কতোখানি ছিলেন তার আন্দাজ পাবার একটা উপায় হলো আমাদের বাংলা দেশের পক্ষে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি ছিলেন তা ভাববার আর বোঝবার চেষ্টা করা। রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিয়ে আমরা আমাদের যুগটাকে বুঝতেই পারি না। ভোলতেয়ারের কথা বাদ দিয়ে ফরাসীরাও তাদের ওই যুগটার কথা ভাবতে বা বুঝতে পারে না। তাদের দেশের সে-যুগ হলো ফরাসী-বিপ্লবের যুগ।

জীবনের এই সময়টাতেই, এবং এখানে বসেই, ভোলতেয়ার তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি লিখেছিলেন।

কী রকমের লেখা?

এগুলি প্রধানতই হলো উপন্যাস—অন্তত প্রথমটায় গল্প-উপন্যাস বলেই মনে হয়। এমনকি, মনে হয় আষাঢ়ে গল্পের মতো, যতো রাজ্যের আজগুবি আর অসম্ভব ব্যাপার বুঝি। আসলে কিন্তু একেবারেই তা নয়। বাইরের চেহারাটা আরব্য-উপন্যাসের মতো মনে হলেও, সত্যি বলতে এগুলো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার, অন্য জিনিস।

কী তাহলে?

মতবাদের লড়াই বলা যায়। মতবাদের লড়াই বললেই সবচেয়ে নির্ভুল বর্ণনা দেওয়া হবে। তার মানে, পড়বার সময় যদিও মনে হয় আরব্য-উপন্যাসের মতো গল্প, তবুও কিন্তু আসলে

উদ্দেশ্যটা গল্প বলা নয়—তার বদলে বিপক্ষের মতবাদ নিয়ে এমন তীক্ষ্ণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যে তার আঘাতে সে-মতবাদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পড়তে পড়তে আমরা যে হেসে উঠি তার দরুন বিপক্ষের মতবাদটাই হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

একটা নমুনা দেওয়া যাক।

একটা উপন্যাসের নাম 'হুরোন—প্রকৃতির শিষ্য।'

হুরোন বলে এক-জাতের রেড-ইণ্ডিয়ান এক যুবক নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে ফরাসী-দেশে এসে পড়লো। সহজ-সরল মানুষটি সভ্যতার আদব-কায়দা জানে না, তাকে কেউ ধর্মতত্ত্ব শেখায় নি। ফরাসী-দেশে আসবার পর তাকে তো ঘটাপটা করে খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করা হলো। কিন্তু খ্রীষ্ট-ধর্মের মহিমা তার জানা ছিলো না, কেননা সে-সব কথা তাকে শেখানো হয়নি। ফলে লোকটা বড্ড বেশি সরাসরি ভাবে, বড্ড সরল সব প্রশ্ন করে বসে। যেদিন তার বিয়ে হবে সেদিন সে শুনলো, বিয়ের সময় সাক্ষী লাগবে, পুরুত লাগবে, চুক্তি সই করতে হবে, দিব্বি গালতে হবে। হুরোন অবাক হয়ে বললো, তোমরা দেখছি ভারি শয়তান ধরনের লোক—নইলে এতো রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কেন?

সত্যিই তো, এতোরকম সাবধানতার দরকার থেকেই বোঝা যায় সহজে বিশ্বাস করবার মতো মানুষ এরা নয়। আর সহজে যদি বিশ্বাস করা নাই যায় তাহলে ভালো লোক হবে কী করে?

এই রকম একের পর এক অভিজ্ঞতা। গল্পের ঢং-টা এমনিই জমাট যে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে যেতে হয়। অথচ, বইটি শেষ হবার পর

হঠাৎ যেন চোখ খুলে যায়, বোঝা যায় পাদ্রি-পুরোহিতেরা যে-সব আচার-আচরণকে অত্যন্ত পবিত্র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রচার করে থাকে সেগুলি সবই হয় কৃত্রিম না হয় তো হাস্যকর আর না হয় তো অত্যন্ত মূর্খের মতো ব্যাপার। যে-কথাগুলোকে দেশের মানুষ এতোদিন পর্যন্ত অমনভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করতো ভোলতেয়ারের উপন্যাস পড়ে দেখা গেলো সেগুলো কী অদ্ভুত হাসির ব্যাপার সব!

তার মানে ওই হাসির উপন্যাসটা সত্যিই উপন্যাস নয়, পাদ্রিদের মতবাদের সঙ্গে তুমুল কঠিন লড়াই করবার আয়োজন। উপন্যাসের গল্পটা আসলে গল্পই নয়, উপন্যাসের মানুষগুলো আসলে মানুষই নয়, ঘটনাগুলো ঘটনাই নয়—আগাগোড়া সবটাই মতের লড়াই।

এই হলো ভোলতেয়ারের কায়দা আর এই কায়দায় তিনি ছিলেন একেবারে অদ্বিতীয়। সিদ্ধহস্ত।

আর ঠিক এই কারণেই ভোলতেয়ার শুধুমাত্র সাহিত্যিক নন, ঔপন্যাসিক নন,—দার্শনিকও। তাঁর যুগের তাঁর দেশের এক-জন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক : পুরোনো কালের মতবাদগুলো ভেঙে নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

সেকালের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভোলতেয়ারের এই উপন্যাসগুলি মতবাদের লড়াই হিসেবে যে কী সাংঘাতিক অস্ত্র ছিলো আজকের দিনে আমাদের পক্ষে তা ঠিকমতো ঠাহর করাই কঠিন। তার কারণ, আজকের মানুষের মন থেকে এইজাতীয় অন্ধ বিশ্বাস অনে-কাংশেই মরে গিয়েছে, ঝরে গিয়েছে—গাছের ডাল থেকে শুকনো

পাতার মতো। তবু ভোলতেয়ারের সংগ্রামকে ঠিকমতো বুঝতে হলে উপন্যাসগুলো যে—সময়ে লেখা সেই সময়টির কথা ভুলে গেলে চলবে না। তখনকার কালের মানুষ এ-জাতীয় বিশ্বাসকেই চরম সত্য মনে করেছে। আজ যদি ওদেশের মানুষের মন থেকে ধর্মমোহ খানিকটা কেটে গিয়ে থাকে তাহলে তার পিছনে ভোল-তেয়ারের মতো দার্শনিকের অবদান বড়ো কম নয়।

আর যুদ্ধ। ভোলতেয়ার কী ঘৃণাই না করতেন যুদ্ধ বলে এই ঘটনাটিকে। তিনি লিখেছেন, 'যুদ্ধের মতো এতো বড়ো পাপ আর নেই, অথচ যারাই কিনা যুদ্ধ বাধাতে চায় তারাই ন্যায়ের বুলি আর সুবিচারের বুকনি দিয়ে এতোবড়ো অপরাধের উপর মুখোস এঁটে দেয়।' 'খুন করা নিষিদ্ধ, তাই খুনীদের শাস্তি হয়—কেবল সেই সব খুনীদের নয় যারা কিনা দল বেঁধে দামামা পিটিয়ে খুন করতে বের হয়।' 'একটি মানুষের পক্ষে বড়ো হয়ে উঠতে সময় লাগে বিশ বছর, তিন হাজার বছর লেগেছে মানুষটির শরীরের রহস্য আন্দাজ করতে, অনন্তকাল কেটে যাবে তার মনের রহস্য বুঝতে—অথচ তাকে শেষ করে ফেলতে সময় লাগে কতোটুকু? মাত্র এক মুহূর্ত।'

ভোলতেয়ার যুদ্ধকে সত্যই ঘৃণা করতেন।

আর ওই ঘৃণা যখন বিদ্রূপের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেতো? মনে হতো, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে ভোলতেয়ারের লেখনার মতো নির্মম অস্ত্র পৃথিবীতে বুঝি দুর্লভ।

* * * *

মাইক্রোমেগাস বলে একটি উপন্যাস, খানিকটা যেন 'গালিভারের ভ্রমণ'-এর ধাঁচে লেখা। আকাশে কালপুরুষের পায়ের কাছে লুব্ধক বলে যে বিরাট নক্ষত্র সেখানকার একটি মানুষ পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে, আসবার সময় সঙ্গে ডেকে এনেছে শনিগ্রহ থেকে তার এক স্যাঙাতকে। লুব্ধক নক্ষত্রের অনুপাতেই লম্বা-চওড়া চেহারা তার বাসিন্দার—৫০০,০০০ ফিট ঢ্যাঙা ; শনিগ্রহের ভদ্রলোকটি লম্বায় মাত্র হাজার কয়েক ফিট, নিজের এই বেঁটেখাটো চেহারাটি নিয়ে বেচারা বিলক্ষণ লজ্জিত।

দুজনে ভূমধ্যসাগর হেঁটে পার হচ্ছিলো, সমুদ্রের জলে লুব্ধকের বাসিন্দাটির গোড়ালি ভিজে গেলো। পাশ দিয়ে চলেছিলো এক মস্ত জাহাজ, লুব্ধকের লোকটি একটা ছোট্ট পোকা ধরবার মতো করে জাহাজটা তুলে নিজের নখের ওপরে রাখলো।

জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে অসম্ভব হৈ-হল্লা পড়ে গেলো।

ঝোড়ো মেঘের মতো করে ঘাড় বেঁকিয়ে লুব্ধকের লোকটি তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। বললো, ওহে বুদ্ধিমান পরমাণুর দল, শরীর বলে—অতএব মগজ বলে--কোনো পদার্থ তোমাদের থাক আর নাই থাক, তোমরা মনে করো যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমাদেরই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

জাহাজে ছিলো একজন খুব নামকরা দার্শনিক। সে বললো, 'আমাদের খুলির ভেতর যথেষ্ট ঘিলু আছে, আর তাই জন্যেই তো আমাদের অনন্ত দুর্বুদ্ধি।…নমুনা দেখুন ঃ ঠিক এই মুহূর্তটিতে

আমাদের জাতির একশো হাজার টুপিপরা জানোয়ার আরো একশো হাজার পাগড়ি-পরা জানোয়ারকে খুন করতে উঠে পড়ে লেগেছে। খুন করতে না পারলেও তারা তো অন্তত খুন হয়ে যাচ্ছে। অনাদি-অতীত থেকে আমাদের মানবজাতির এই মহিমা চলে আসছে।'

'বদমায়েসের দল,'—লুব্ধকের লোকটি রাগে চীৎকার করে উঠলো,—'ইচ্ছে হচ্ছে দুচার পা হেঁটে এই খুনীদের পুরো বাসাটাকে পায়ে দলে শেষ করে দি।'

জাহাজের দার্শনিক বললেন, 'মশায়কে আর অতো কষ্ট করতে হবে না। নিজেদের ধ্বংস করবার ব্যাপারে ওদের নিজেদের উৎসাহ-অধ্যবসায়টুকুই যথেষ্ট। দেখুন না, দশ বছর পরে হতভাগাদের একশো ভাগের এক ভাগও আর বেঁচে থাকবে না। তাছাড়া, শাস্তি যদি দিতে চান তাহলে বরং ওই নিষ্কর্মা জানোয়ারগুলোকে শাস্তি দিন, যারা কিনা প্রাসাদের মধ্যে বসে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করবার আদেশ দিচ্ছে আর খুনের পর পবিত্রভাবে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে'।

নয়

সিরে বলে ওই ছোট্ট গ্রামে একদিন চিঠি এলো রাজা ফ্রেড্‌রিখ্‌ দি গ্রেটের কাছ থেকে—তখনো অবশ্য তিনি শুধুই যুবরাজ ফ্রেড্‌রিখ্‌। অর্থাৎ কিনা, দি গ্রেট তখনো হন নি।

ভোলতেয়ারের প্রতিভায় যুবরাজ মুগ্ধ। ভোলতেয়ারকে অতিথি হিসেবে পেলে তিনি সম্মানিত বোধ করবেন।

আসলে, ফ্রেড্‌রিখ ছিলেন খানিকটা যেন দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ। রাজা হলেও গুণের আদর জানতেন, বিজ্ঞান আর সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতে ভালোবাসতেন। তাই জ্ঞানীগুণীদের প্রায়ই আমন্ত্রণ পড়তো তাঁর রাজদরবারে।

অনেকটা যেন বিক্রমাদিত্য আর তাঁর নবরত্নের সভা!

সানন্দে ভোলতেয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

প্রথম দিকটায় ফ্রেডরিখের সঙ্গে তাঁর সে কী ঘনিষ্ঠতা! দুজনেই কথা বলতে পারতেন আশ্চর্য ভালো, দুজনেরই অগাধ-উৎসাহ বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিয়েই ঠোকাঠুকি লেগে গেলো আর তারপর বেরিয়ে পড়লো ফ্রেডরিখের গোপন কুৎসিত রাজদম্ভ।

ব্যাপারটা কী হয়েছিলো তাই বলি। ফরাসী-দেশ থেকেই

ফ্রেডরিখ মোঁপার্তুই বলে এক মস্ত বড়ো গণিতজ্ঞকে রাজ-দরবারে আনিয়েছিলেন—নবরত্নের একটি রত্নের মতো। গণিত-বিজ্ঞানেরই এক সমস্যা নিয়ে কোয়েনিং বলে নিম্নপদস্থ এক জার্মান বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে মোঁপার্তুই-এর দারুণ মতভেদ হলো। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিবাদ-ব্যাপারে স্বয়ং রাজাও যোগ দিলেন, তিনি নিলেন মোঁপার্তুই-এর দিক। ভোলতেয়ারও যোগ দিলেন, কিন্তু রাজার বিপক্ষে—কোয়েনিং-এর দিকে।

তর্ক-বিতর্ক হতে লাগলো। উত্তেজনাও। ভোলতেয়ার এক বন্ধুর কাছে চিঠিতে লিখছেন, 'দুর্ভাগ্যবশত আমিও হলাম লেখক এবং এখন আমি রাজার বিপক্ষ শিবিরে। আমার হাতে অবশ্যই রাজদণ্ড নেই, তবু তো কলম আছে।'

কলমের জোরও তো সত্যিই কম নয়। মোঁপার্তুইকে বিদ্রূপ করে তিনি একখানা বই লিখলেন। বইটি তিনি রাজাকে পড়ে শোনালেন। এমন ধারালো পরিহাস যে শোনবার পর রাজা নাকি নিজেও সারারাত হাসিতে গড়াগড়ি খেয়েছিলেন। কিন্তু যে-মত নিয়ে এই বিদ্রূপ রাজা তো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে সে-মত সমর্থন করে বসেছেন। তাই রাজা নিজের মান বজায় রাখবার জন্যে ভোলতেয়ারকে অনুরোধ করলেন—বইটা দয়া করে প্রকাশ করবেন না।

কিন্তু সর্বনাশ! বইটা তখন ছাপাখানায়। কেননা, ভোলতেয়ার তো ইতিমধ্যেই বইটার কপি প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন! আর প্রকাশকের সঙ্গে ভোলতেয়ারের যে-চুক্তি তা কিছুতেই বদল করা সম্ভব নয়।

অবশেষে প্রকাশিত হলো বইটা। রাগে জ্বলে উঠলেন রাজা। আর ভোলতেয়ার? রাজ-দরবার থেকে তিনি সরাসরি চম্পট দিলেন। কিন্তু রাজার রাগ অতো সহজ নয়। রাজ-পেয়াদার দল পিছু নিলো ভোলতেয়ারের। তারা শেষ পর্যন্ত ভোলতেয়ারকে ধরে ফেললো! বললো, রাজার লেখা একটা বইএর পাণ্ডুলিপি ভোলতেয়ারের কাছে আছে, সেটা ফেরত না দিলে তাঁকে বন্দী করা হবে।

কিন্তু সর্বনাশ! যে-বাক্সটায় ওই পাণ্ডুলিপি ছিলো এই হট্টগোলের মধ্যে সেটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! তাহলে? যতোদিন না বাক্সটা পাওয়া যায় ততোদিন কয়েদখানা!

বাক্সটা খুঁজে পেতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগলো। ততোদিন পর্যন্ত ভোলতেয়ার বন্দী হয়েই রইলেন।

ইতিমধ্যে আর-এক হাঙ্গামা। এক বইওয়ালা ভোলতেয়ারের কাছে কিছু টাকা পেতো। সে ভাবলো, এই বেলা টাকাটা আদায় করতে না পারলে আর বুঝি আদায়ই হবে না। খাঁচায় পোরা বাঘের মতো ভোলতেয়ার তখন গজরাচ্ছেন, এই অবস্থায় বইওয়ালা টাকার জন্যে হামলা করতে এলো।

রাগে অন্ধ হয়ে ভোলতেয়ার তার কানের ওপর এক ঘুঁসি কষিয়ে দিলেন।

কানের উপর প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে লোকটা তো চোখে শর্ষে ফুল দেখছে! ভোলতেয়ারের সেক্রেটারি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন: মশায়ের কী সৌভাগ্য, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মহা-পুরুষের স্পর্শ পেলো মশায়ের কান!

দশ

শেষ পর্যন্ত বাক্সটা খুঁজে পাওয়া গেলো। মুক্তি পেলেন ভোলতেয়ার। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? ফ্রান্সে ফিরে যাবেন নাকি?

উঁহুঁ। তা সম্ভব নয়। কেননা সেই সময়েই তিনি খবর পেলেন, ফরাসী সরকার তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি নির্বাসন-আজ্ঞা জারি করেছে। অতএব ভোলতেয়ার ফ্রান্সে ঢুকতে পাবেন না।

নির্বাসন কেন? সেও একটা বইএর ব্যাপার। বইটা তিনি লিখেছেন—সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসের বই,—কিন্তু মামুলি ধরনের রাজারাজড়াদের গৌরব-কাহিনী নয়। তাঁর যুগ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসের যে-বিকাশ ভোলতেয়ার তারই ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন—সে-ব্যাখ্যায় রাজারাজড়াদের কাহিনীই বড়ো কথা নয়। সবচেয়ে বড়ো হলো মানুষের কথা। যুগের পর যুগ ধরে মানুষ কী ভাবে এগিয়েছে, কী ভাবে বিকশিত হয়েছে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক। আর রাজারাজড়াদের খামখেয়ালি শক্তি কী ভাবে যুগের পর যুগ ধরে কঠিন বাধা সৃষ্টি করেছে এই অগ্রগতির পথে, তারই পরিচয়। ভোলতেয়ার

প্রশ্ন তুললেন, ইতিহাস মানে কী? ইতিহাসের গতি কোন পথে? কোন দিকে এগুবে আগামী কালের মানুষ? আর এ-সব প্রশ্নের যে-জবাব তিনি দিলেন তা পড়ে তখনকার ফরাসী সরকার মোটেই খুশি হয় নি।

নিজের দেশে ফেরবার পথ বন্ধ! অগত্যা জেনেভার কাছে কিছু জমিজমা কিনলেন। এতোদিনে তাঁর মন রীতিমতো তেঁতো হয়ে গিয়েছে। তিনি ভাবলেন, রাজদরবারে বসে রাজার সঙ্গে সাহিত্য-চর্চা করার চেয়ে নিজে হাতে বাগান করা ঢের ভালো কাজ। বাগানের কাজে তিনি মন দিলেন।

সেখান থেকে কিছুদিন পরেই ফরাসী-দেশের কিনারার খুব কাছে সুইস্-সরকারের এলাকায় ফ্যার্নে বলে আর একজায়গায় গিয়ে আস্তানা করলেন। বয়েস তখন চৌষট্টি পেরিয়ে গিয়েছে। ভাবলেন, এবার জীবনে একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করা যাক।

বাগানের কাজে মন দেওয়ায় শান্তি আছে। বাগানের কাজে মন দিলেন ভোলতেয়ার।

কিন্তু ভোলতেয়ার যেখানেই যান ইয়োরোপের সংস্কৃতির কেন্দ্রও যেন সেখানেই সরে যায়। দেশ-বিদেশ থেকে গণ্যমান্য মানুষেরা ফ্যার্নে-তে ভিড় করতে লাগলেন—ভোলতেয়ারের সঙ্গে দুটো কথা বলে যাওয়া, দুটো বিষয়ের আলোচনা করে যাওয়া—এ-যেন সকলের কাছেই এক পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আর শুধু গণ্য মানুষই বা কেন—সব রকমের মানুষ—কেউ শুধু ভক্তিভরে একবার চোখের দেখা দেখে আসতে চায়, চায় বন্ধু

মহলে জাঁক করে গল্প বলতে। কারুর কাছে যেন তীর্থ-দর্শন, কারুর কাছে শুধুই ফ্যাশান।

ভোলতেয়ার নাকি একবার অতিথিদের ভিড়ের চোটে খেপে গিয়ে বলেছিলেন, হোটেলওয়ালা হয়ে দাঁড়িয়েছি দেখছি!

রাশি রাশি চিঠি। অজস্র প্রশ্ন মানুষের। ভোলতেয়ার শ্রান্ত বোধ করেন। বলেন, বয়েস এতো হলো—এবার যে একটুখানি মনের শান্তিতে বাগান করবো তারও উপায় নেই দেখছি! কিন্তু ভোলতেয়ারের মতো মানুষের পক্ষে সত্যিই ওরকম মনের শান্তি পাবার নয়।

১৭৫৫। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লিস্‌বন শহর মিশমার হয়ে গেলো। মারা গেলো প্রায় ৩০,০০০ মানুষ! সেদিন খ্রীষ্টানদের কী একটা পুজোর দিন ছিলো, তাই গির্জেগুলিতে মানুষের দারুণ ভিড়,—গির্জা চাপা পড়লো বলেই মৃত্যু হলো অতো মানুষের।

ফরাসী পাদ্রিরা বললেন, এ-হলো লিস্‌বনের মানুষদের পাপের ফল—ঈশ্বর তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। মঙ্গল-ময়ের লীলা কী অপরূপ!

এ-রকম ভণ্ডামির কথা শুনলে ভোলতেয়ারের মতো লোক রাগে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবেন না? তিনি বিদ্রূপের কবিতায় ফেটে পড়লেন: হয় বলো তোমাদের ওই মঙ্গলময়টির শক্তি আছে কিন্তু সদিচ্ছে নেই, আর না-হয়তো বলো তাঁর সদিচ্ছে আছে কিন্তু শক্তি নেই। হয় তিনি ভালো করতে পারেন তবু ভালো করতে চায় না, না-হয়-তো তিনি ভালো

করতে চান কিন্তু পারেন না। তা না হলে, পৃথিবীতে যা-ঘটছে তার সবই যদি তাঁর ইচ্ছেয় ঘটে তাহলে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটবে কেমন করে?

ভোলতেয়ার বললেন, নির্বুদ্ধি মানুষ! নইলে ভগবানের কথা ভেবে এমনভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করতে রাজি হয়?

মাস কতক পরেই শুরু হলো ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের যুদ্ধ—সাত-বছরের-যুদ্ধ! কানাডার বিঘে কতক তুষার-ঢাকা জমি ইংলণ্ডের শাসনে আসবে না ফ্রান্সের শাসনে আসবে তাই নিয়ে দুটো দেশেরই হাজার হাজার মানুষ খুন করবার আয়োজন!

ভোলতেয়ার বললেন, নির্বুদ্ধি মানুষ! এটুকু বুঝছে না যে এর নাম আত্মহত্যা!

ভোলতেয়ারের মন রাগে গনগন করছে। এমন সময় রুসো বলে ফরাসী দেশের আর একটি লেখক ভোলতেয়ারের ওই লিস্‌বনের ভূমিকম্পের উপর লেখা কবিতাটির জবাব দিলেন।

রুশো বললেন, ঠিকই তো হয়েছে! এ তো মানুষেরই দোষ। মানুষ কেন অরণ্য ছেড়ে নগর গড়তে এগুলো। সভ্যতা বলে ব্যাপারটাই যে ভালো নয়। ভুল।—মানুষ যদি প্রকৃতির শিশু হিসেবে খোলা আকাশের তলায় বাস করতো, যদি বাড়ি-ঘর না তুলতো, তাহলে নিশ্চয়ই এইভাবে মানুষের পক্ষে বাড়ি-চাপা পড়ে মরবার কারণ ঘটতো না।

রুসোর মতবাদটা মনে রাখতে হবে, তা নইলে ভোলতেয়ারের বিরুদ্ধে তাঁর ওই জবাবটাকে ঠিকমতো বোঝাই যাবে না। রুসো মনে করতেন, আধুনিক যুগে মানুষের জীবনে এতো যে দুঃখ-কষ্ট

লাঞ্ছনা-অপমান—এর আসল কারণ হলো মানুষ প্রকৃতির সন্তান হিসেবে সহজ সরল জীবনটি ছেড়ে ভুল পথে এগিয়ে ভুল ক'রে সভ্য হয়ে উঠেছে। যতো-নষ্টের-গোড়া এই সভ্যতা ছেড়ে আবার সেই অরণ্যের আদিম জীবনে ফিরে যেতে পারলেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি!

বলাই বাহুল্য, ভোলতেয়ারের কাছে এর চেয়ে হাস্যকর মতবাদ আর কিছুই হতে পারে না। তিনি মনে করতেন আজকের মানুষের এতো যে-দুর্গতি তার কারণ, অলস আর অসাধু একদল মানুষের হাতে শাসনের ক্ষমতা রয়েছে। তারাই সৃষ্টি করছে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বাধা। তাদের সেই বাধা ভেঙে বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীকে আরো বেশি করে আরো ভালো করে জয় করতে পারলেই মানুষেরা মুক্তি পাবে।

রুসোর জবাব পড়ে ভোলতেয়ার একেবারে খেপে উঠলেন।

একদিকে পাদ্রিদের ওই কপট বোলচাল, ভণ্ডামি। আর একদিকে রুসোর এই হাস্যকর প্রস্তাব—দুপা ছেড়ে মানুষকে আবার চারপায়ে চলবার উপদেশ! এই ভণ্ডামি আর এই ন্যাকামিকে একেবারে খানখান করে দিতে হবে!

ভোলতেয়ার মুঠো করে ধরলেন তাঁর সেই অমোঘ অস্ত্র। তাঁর লেখনী। বজ্রের মতো কঠিন তাঁর এই অস্ত্র!

তিনদিন ধরে একটানা লিখে তিনি শেষ করলেন একটি উপন্যাস। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস। ক্যান্‌ডাইড্।

এমন জমাট গল্প আর বুঝি পড়ি নি। পড়তে পড়তে হাসিতে গলা ব্যথা করে। অথচ, আসলে গল্পই নয়। হাসির গল্প তো নয়ই। মতবাদের লড়াই।

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই? পাদ্রি-পুরোহিতেরা তো তাই বলেন।

বর্বরতার অবস্থায় ফিরে যেতে পারলেই মানুষ আজকের এতো দুঃখ থেকে মুক্তি পেতো? রুসো তো সেই কথাই প্রমাণ করতে চাইলেন।

কিন্তু,

ক্যান্‌ডাইড্‌ বলে ওই উপন্যাসখানা পড়তে পড়তে মনে হয়, কী অসম্ভব আর আজগুবি এ-সব কথাবার্তা! হাসতে হাসতে দম ফেটে যায়,—এই ধরনের কথাবার্তায় বিশ্বাস নিয়েই হাসি।

ক্যান্‌ডাইডের গল্পটা একটুখানি বলে নি।

ক্যান্‌ডাইড্‌ হলো উপন্যাসের নায়কের নাম। কিন্তু নামটার একটা মানে আছে। ক্যান্‌ডাইড্‌ মানে সরল মানুষ। যে-কথা তাকে শেখানো হয় সে-কথাই সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বসে।

ছোটো-বেলায় এক অতি-বড়ো বিদ্বান অধ্যাপকের কাছে ক্যান্‌ডাইড্‌ শিক্ষা পেয়েছিলো। অধ্যাপকের নাম প্যান্‌গ্লস্‌।

প্যান্‌গ্লস্‌ বলতেন, ঈশ্বরের কী মহিমা! ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্যে। দেখো না, মানুষের নাকের গড়নটা ভগবান এমনই করেছেন যে চশমা-জোড়া দিব্বি এঁটে বসে! মানুষের পায়ের গড়নটা এমনিই নির্ভুল যে মোজাজোড়া একেবারে ফিট করে যায়। প্রাসাদ বানানোর জন্যে ঠিক যে-রকমটি পাথরের দরকার সেই রকমের পাথরই তিনি সৃষ্টি

করেছেন, সারা বছর মাংসের জোগান থাকার জন্যে ঠিক যে-রকমটি দরকার সেই রকম শুয়োরই তিনি সৃষ্টি করেছেন !

ঈশ্বরের কী মহিমা ! ক্যান্‌ডাইড্‌ সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করলো ঈশ্বরের মহিমা অসীম অপার ! আর তারপর, নানা রকম ঘটনাচক্রের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একদিন দাম্ভিক জমিদারের লাথির ঠোক্কর খেয়ে আমাদের ওই সরল নায়কটি ছিটকে পড়লো বৃহত্তর পৃথিবীর মধ্যে।

সম্বল বলতে শুধু সেই অধ্যাপকের শিক্ষা ! ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে !

তারপর একের পর এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ! প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই ফুটে উঠতে থাকে অধর্মের জয়, ধর্মের পরাজয়। অসাধুতার জয়, সাধুতার পরাজয়। ভণ্ডামির আর বদমাইসির আর প্রতারণার আর মিথ্যার ভিত্তিতে সবকিছুই ঘটে চলেছে ! সরল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে ক্যান্‌ডাইড্‌ মনে করে, মানুষকে এইভাবে দুঃখ-দুর্দশা দিয়েই হয়তো লীলাময় তাঁর কূট অভিলাষ পূরণ করতে চাইছেন।

প্যানগ্লস্‌ তাঁকে শিখিয়েছিলেন, দুঃখ দেখে অধীর হয়ে পড়লে চলবে না। লীলাময় তোমাকে কৃপা করবার আগে পরীক্ষা করে নেবেন—দুঃখের পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হতে না পারো তাহলে লীলাময়ের কৃপা পাবে কেমন করে ?

কথাগুলো যে কী অসম্ভব পরিহাস তা কিন্তু ক্যান্‌-ডাইডের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতার মধ্যেই প্রকটভাবে ফুটে ওঠে।

কিন্তু ওই অসভ্য মানুষদের অবস্থা ? সভ্যতার গ্লানি যাদের এখনো স্পর্শ করেনি, যাদের সহজ-সরল জীবন এখনো প্রকৃতির সুরে বাঁধা ? রুসোর ওই আদর্শ আদিম মানুষেরা ?

ঘটনাচক্রের মধ্যে ফেলে ভোলতেয়ার ক্যান্‌ডাইডকে এদের দশাটাও দেখিয়ে আনতে ভোলেন নি। আর ক্যান্‌ডাইড্‌ দেখলো আধা-জানোয়ারের মতোই এদের দশা—সভ্য মানুষের পক্ষে এদের খুব বেশি হিংসে করবার কারণ নেই ; এই অসভ্য মানুষদের মধ্যে ক্যান্‌ডাইডের অ্যাড্‌ভেন্‌চার-কাহিনী পড়বার পরও রুসোর মতবাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে রাখা দুষ্কর।

অনেক ঘুরলো ক্যান্‌ডাইড্‌। ভোলতেয়ারের মতোই। নানান দেশে, নানান অভিজ্ঞতার ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে।

আর এইভাবে ঘুরতে ঘুরতেই ক্যান্‌ডাইড্‌ দেখে এলো এক সব-পেয়েছির দেশ। সে দেশ কেমনতরো ?

ছেলেরা পথের ধারে সোনার ঘুঁটি নিয়ে খেলা করে, সোনার তাল সে-দেশে পাথরের নুড়ির মতোই তুচ্ছ, মূল্যহীন। খাবারের দোকানে খাওয়া-দাওয়ার পর দোকানদারকে পয়সা দিতে গেলে সে অবাক হয়ে যায়। খাওয়ার জন্যে পয়সা আবার কী ? মানুষকে পেট ভরে খাওয়াবার দায়িত্ব তো সরকারের ; তাই দোকানদারদের যা প্রাপ্য তা তারা সরকারের কাছ থেকেই পাবে, তার জন্যে যারা খেতে এসেছে তাদের মাথাব্যথার কারণ নেই। লোকজনকে যদি শুধোনো যায়, কয়েদখানা কোথায়, আদালত কোথায়—তাহলে তারা কিছু বুঝতেই পারে না। শাসক নেই,

শাসন করবার দরকার নেই—সবাই সমান, সবাই স্বাধীন, মানুষে-মানুষে সত্যিই ভাই-ভাই ভাব।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এই ছিলো ফরাসী বিপ্লবের ডাক। আর তাই ভোলতেয়ার সব-পেয়েছির দেশ বলে যে-ছবিটি আঁকলেন তার মূলেও ওই তিনটি কথা : সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

রাজা নেই। পুরোহিত নেই। দরবার নেই, মন্দির নেই, গির্জা নেই। তার বদলে রয়েছে বিজ্ঞানের গবেষণাগার। কী বিরাট! কী আশ্চর্য! মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে নজর করলে নজর চলে না, ঘরের এ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে ও-প্রান্তের দিকে নজর করলে নজর চলে না। থাকে থাকে যন্ত্রপাতি সাজানো—কতো আশ্চর্য, কতো অপরূপ যন্ত্রপাতি!

বাস্তিল নয়। তার বদলে ভোলতেয়ারের নায়ক মুগ্ধ হলো বিজ্ঞানের গবেষণাগার দেখে। আর ভোলতেয়ার যতোক্ষণ এই সব-পেয়েছির-দেশের ছবি আঁকছেন ততোক্ষণ তাঁর কলমের আঁচড়ে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ নেই—তার বদলে মুগ্ধ বিস্ময়, আশা আর আনন্দ আর বিশ্বাস আর নিষ্ঠা।

ভোলতেয়ার নিজের জীবনে ওই ফরাসী-বিপ্লব দেখে যেতে পারেন নি। ফরাসী বিপ্লবের ফলে দেশের বুকে ওই সব-পেয়েছির-দেশ গড়ে উঠলো কিনা সে-কথা অন্য। সত্যি বলতে কি, তা গড়ে ওঠে নি। দেশের মানুষ সত্যিই পায় নি ওই সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতা। তবুও এ-বিপ্লবের ফলে দেশের ইতিহাসে যে-পরিবর্তন দেখা দিলো তার মূল্যও বড়ো কম নয়। অবসান ঘটলো সামন্ত শাসনের—রাজারাজড়া আর পুরোহিতদের দাম্ভিক

অত্যাচারের। গড়ে উঠলো নতুন ধনতান্ত্রিক সভ্যতা। এও একটা যুগান্তর বই কি, মানুষের ইতিহাসে বিরাট অগ্রগতি।

আর এই বিপ্লবের জন্যে যাঁরা মানুষের. মনকে তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ভোলতেয়ার। মনকে তৈরি করা বলতে প্রধানতই হলো পুরোনো কালের সংস্কারগুলো ভাঙা,—ধর্মমোহ ভাঙা, রাজভক্তি ভাঙা, বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা।

এগারো

অবশ্যই ভোলতেয়ার একা নন। ক্রমশই দেখা গেলো আরো একদল উদীয়মান চিন্তাশীল ঠিক এই কাজেই মেতে উঠেছেন। তাঁরাও সকলেই মানুষের মন থেকে অলৌকিক বিশ্বাস সরিয়ে এই লৌকিক পৃথিবীটাকেই, এই লৌকিক পৃথিবীর নিয়মকানুন-গুলোকেই, অতি বড়ো সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন।

স্বভাবতই এই উদীয়মান চিন্তাশীলেরা ভোলতেয়ারকেই নিজেদের শিক্ষাগুরু হিসেবে স্বীকার করলেন। তাই ভোলতেয়ারের জীবন আর ভোলতেয়ারের যুগটাকে ঠিকমতো বুঝতে হলে এঁদের কথাও কিছুটা আলোচনা করা দরকার।

এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন লা-ম্যাত্রি, হেল্‌ভেসিয়াস, হলবাক, দিদারো।

লা-ম্যাত্রি (১৭০৯-১৭৫১) ছিলেন সামরিক বিভাগের ডাক্তার। দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি একটি বই লেখেন এবং এই বইটি লেখবার অপরাধে তাঁর চাকরি যায়। চাকরি গেলো কেন? কেননা ওই বইতে তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে আমাদের শরীরকে তন্ন-তন্ন করে তল্লাস করলেও আত্মা বলে কোনো কিছুর

হদিস পাওয়া যায় না। তার মানে, আত্মা আর কিছুই নয়—মনের কল্পনা। কিন্তু তাহলে আমাদের শরীরটা চলছে কী করে? ঠিক যেমন করে একটা যন্ত্র চলে। তার মানে, আমরা অত্যন্ত জটিল এক-একটি যন্ত্র-বিশেষ।

কথাটা বৈজ্ঞানিকভাবে ঠিক না ভুল,—সে-বিচার অবশ্য আলাদা। আত্মা না থাকলেও মানুষ সত্যিই নিছক যন্ত্রের মতো নয়। কেননা মানুষ চিন্তা করতে পারে, ভাবতে পারে, বুঝতে পারে—ভেবে-চিন্তে পৃথিবীকে বদল করতে পারে। সেদিক থেকে আমরা সত্যিই যন্ত্রের মতো নই। কিন্তু এই ভুলের দরুন লা-ম্যাত্রির চাকরি যায় নি। চাকরি গেলো, তাঁর লেখায় যতোটুকু কথা সত্যি শুধু সেইটুকুর জন্যেই। অর্থাৎ তিনি আত্মা মানেন নি বলেই। আত্মা না মানা মহাপাপ। পাষণ্ডের লক্ষণ!

শুধু চাকরি খোয়ানোই নয়। লা-ম্যাত্রিকে শেষ পর্যন্ত নির্বাসনে দেওয়া হলো।

কিন্তু তাই বলে দেশ থেকে এ-ধরনের চিন্তাধারাকে সত্যিই নির্বাসন দেওয়া গেলো না। হেল্‌ভেসিয়স্‌ (১৭১৫-১৭৭১) বলে আর একজন চিন্তাশীল লা-ম্যাত্রির যুক্তিগুলোই নতুন করে প্রচার করতে লাগলেন।

বিপ্লবের যুগ ঘনিয়ে আসছে। চিন্তাশীলেরা বেপরোয়া হয়ে উঠছেন। অমন বেপরোয়া নাস্তিকতার যুগ ওদেশে আর কখনোই দেখা দেয় নি।

এই বেপরোয়াদের মধ্যে যিনি কিনা প্রধান তাঁর নাম হলো দিদারো (১৭১৩-১৭৮৪)। কী রকম বেপরোয়া তাই বলি।

দিদারো বলতেন, ভগবদ্-ভক্তি আর রাজার অত্যাচার—দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে। পুরোহিতেরা যে রাজভক্তি প্রচার করে তারই দরুন সাধারণ মানুষ মুখ বুঁজে অত্যাচার সহ্য করতে শেখে। অতএব পৃথিবীর শেষ পুরোহিতটির নাড়ি-ভুঁড়ির দড়িতে পৃথিবীর শেষ রাজাটিকে ফাঁসি না দেওয়া পর্যন্ত মানুষের সত্যিই মুক্তি নেই।

কী সাংঘাতিক নাস্তিকতার কথা!

দিদারো বলতেন, স্বর্গকে ধ্বংস না করলে মর্তের উদ্ধার নেই। তাই মানুষের মন থেকে নির্মমভাবে ভাঙতে হবে আধ্যাত্মিক ধারণাগুলো। এই মাটির পৃথিবীটাই, এই জড় জগৎটাই, একমাত্র সত্য। ঈশ্বর নেই, আত্মা নেই, স্বর্গ নেই, নরক নেই। আগেকার কালে আমাদের দেশের চার্বাক বলে পণ্ডিতেরা যে-রকম বলতেন প্রায় সেই-রকমের কথাই। চার্বাকরাও বলতেন, ঈশ্বর আত্মা স্বর্গ নরক—সবই আসলে বানানো কথা; ভণ্ড আর ধূর্ত একদল মানুষ সাধারণ লোককে প্রতারণা করবার জন্যেই এ-সব কথা বানিয়েছে। সত্যি বলতে, আগুন মাটি জল হাওয়া দিয়ে তৈরি এই জড়জগৎটাই একমাত্র সত্য, দেহ ছাড়া আমাদের আত্মা বলে আর কিছুই নেই।

পণ্ডিতদের ভাষায়, এ-ধরনের মতবাদেরই নাম হলো জড়বাদ বা বস্তুবাদ।

আর দিদারো তাঁর এই মতবাদকে প্রচার করবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠলেন। তিনি একটি বিশ্বকোষ সম্পাদনা করবার কাজ শুরু করলেন—তাতে জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত

বিষয়ই আলোচনা করে দেখানো হবে যে এই মতটাই খাঁটি সত্য।

বিশ্বকোষ-কে বিদেশী ভাষায় বলে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। আর তাই দিদারোর ওই দলবলটির নাম দেওয়া হয় এন্‌সাইক্লো-পিডিস্টস্‌।

স্বভাবতই তখনকার ফরাসী সরকার এই বিশ্বকোষের বিরুদ্ধে নানা রকম আইন জারি করেছিলো, নানানভাবে লাঞ্ছনা দিয়েছিলো দিদারোকে, দমন করবার চেষ্টা করেছিলো তাঁর বিশ্বকোষকে। কিন্তু দিদারোও খুব সহজ লোক ছিলেন না। সমস্ত রকম অত্যাচার আর নির্যাতন সত্ত্বেও চালিয়ে গিয়েছিলেন এই বিশ্বকোষের কাজ।

আর ঠিক যেন তেমনি স্বাভাবিকভাবেই ভোলতেয়ার হয়ে উঠলেন এই বিশ্বকোষ-ওয়ালাদের নেতা। দিদারোর অনুরোধে বিশ্বকোষটির জন্যে একের পর এক প্রবন্ধ লিখে চললেন ভোলতেয়ার। দর্শনের ইতিহাসে ভোলতেয়ারের এই প্রবন্ধগুলি অপরূপ সম্পদ। বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ে ভোলতেয়ারের ভাষায় আর সে-আলোয় উদ্ভাসিত হয় হিমালয়ের মতো বিশাল তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার।

বিশ্বকোষের কাজ চোকাবার পর ভোলতেয়ারের ঝোঁক হলো, সরাসরি দর্শন-শাস্ত্রের বই লেখবার। 'দর্শনের অভিধান' বলে তিনি একখানা বই রচনা করলেন—বিশ্বকোষটা যে-রকম দশজনে মিলে লেখা এটা সে-রকম নয়; আগাগোড়াই ভোলতেয়ারের একার লেখা।

বারো

ফ্যার্নে-তে বাগান করেন আর দর্শন-শাস্ত্রের চর্চা করেন। ভোলতেয়ারের বয়েস তখন প্রায় সত্তর বছর হলো। মনে হলো, এতোদিনে বুঝি তাঁর ভেতরকার আগুনটা স্তিমিত হয়ে আসছে। এবার হয়তো ঋষিদের ছবির মতো শান্ত ধ্যানমগ্ন জীবনে থিতিয়ে বসতে পারেন।

কিন্তু হঠাৎ সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো।

আবার যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো ভোলতেয়ারের লেখনী আর তারই আগুন যেন দাউ-দাউ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সারা দেশময়। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে ভোলতেয়ার আবার নতুন করে সংগ্রামের পথে নামলেন আর তাঁর এবারকার সংগ্রাম দুর্ধর্ষ, ভয়ংকর।

হঠাৎ আবার কী হলো? মানুষটা আবার অমনভাবে খেপে উঠলো কেন?

সে অনেক ব্যাপার। একে একে বলি।

ফ্যার্নের খুব কাছেই তুলোঁ বলে শহর—ফরাসী দেশের সাতটি বড়ো বড়ো শহরের মধ্যে একটি। সে-সময়ে এই শহরটিতে

রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদের প্রায় একচেটিয়া শাসন ছিলো।

রোমান ক্যাথলিক মানে ? খ্রীষ্টানেরা দুটো দলে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। একটি সম্প্রদায়ের নাম রোমান ক্যাথলিক আর একটির নাম প্রোটেস্ট্যান্ট। আগেকার কালে রোমই ছিলো খ্রীষ্টধর্মের প্রধান ঘাঁটি; এই ঘাঁটিতে যিনি হলেন প্রধান পুরোহিত তাঁকে বলে পোপ। মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) বলে একজন জার্মান পাদ্রি এই পোপের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করেন। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, রোমকে ঘাঁটি করে এবং পোপ-এর শাসন মেনে খ্রীষ্টধর্মের যে-রূপটি ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত কদর্য—যীশুখৃষ্টের প্রকৃত বাণীর সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের এই রূপটির কোনো সম্পর্ক নেই। তাই লুথার আন্দোলন শুরু করেন : পোপের শাসনের অবসান চাই, খ্রীষ্টধর্মের আমূল সংস্কার চাই। ক্রমে লুথারের আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে, যাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মকে শুধরে নিতে চাইলেন তাঁদের বলা হয় প্রোটেস্ট্যান্ট। কিন্তু সমস্ত খ্রীষ্টানই যে লুথারের ধর্ম-সংস্কার মেনে নিলো তা নয়। যারা মানলো না, যারা আগেকার গোঁড়া মতবাদকেই আঁকড়ে থাকতে চাইলো, কায়েম রাখতে চাইলো পোপের শাসন আর রোমের দম্ভ—তাদেরই বলে রোম্যান ক্যাথলিক।

রোম্যান ক্যাথলিকেরা ঢের বেশি গোঁড়া। রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতেরা প্রোটেস্ট্যান্টদের পাষণ্ড মনে করে—নানানভাবে তাদের শাস্তি দিতে চায়।

আর এ-হেন রোমান ক্যাথলিকদেরই দাপট ছিলো তুলোঁ

বলে ওই ফরাসী শহরটিতে। সে-শহরে তো তাই প্রোটেস্ট্যান্টদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার কথাই।

ফ্যানে বলে ভোলতেয়ারের আস্তানাটি যদিও কিনা ফরাসী দেশের সীমানার বাইরে পড়ে তবুও তুলোঁ-শহর থেকে তা খুব বেশি দূর নয়। তুলোঁ শহরে রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতদের অত্যাচারের তাণ্ডব কাহিনী ভোলতেয়ারের কানে আসতে লাগলো।

সেই একই ব্যাপার। পুরোনো ধর্মমোহ, আর এই ধর্ম-মোহর দরুন মানুষের উপর অত্যাচার—ভোলতেয়ারের লেখনী রাগে ফেটে পড়বে না?

তুলোঁ শহরে প্রোটেস্ট্যান্ট হলে ডাক্তার হওয়া চলবে না, উকিল হওয়া চলবে না, মুদি হওয়া চলবে না, বইএর দোকান দেওয়া চলবে না; এমন কি ঘরসংসারের জন্যে ঝি-চাকর বা রাঁধুনী হিসেবে প্রোটেস্ট্যান্টদের বাহাল করা বেআইনি। দাই হিসেবে একটি প্রোটেস্ট্যান্ট মেয়েকে কাজ দেবার জন্যে এক জনের এক-হাজার ফ্রাঁ জরিমানা হয়ে গেলো!

শুধু কি তাই? আরো কতোরকম অত্যাচারের কাহিনী ভোলতেয়ারের কানে আসতে লাগলো তার দুএকটা নমুনা বলি।

তুলোঁতে এক প্রোটেসট্যান্ট বুড়ো ছিলো। তার ছেলে আত্মহত্যা করে। সে-শহরের আইন অনুসারে যে-কেউ আত্ম-হত্যা করবে তার মৃতদেহ নিয়ে এক বীভৎস কাণ্ড বাধানো হবে—মৃতদেহকে উলঙ্গ করে, দড়ি বেঁধে কাঠের সঙ্গে হেঁটমুণ্ড করে সারা শহরময় ঘোরানো হবে। এই দৃশ্যর কথা ভেবে বুড়ো বাপ

তো শিউরে উঠলো আর তাই চেনা-পরিচিতদের গিয়ে ধরলো যাতে আত্মহত্যার কথা চেপে গিয়ে স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবেই একটা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। কথাটা রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদের কানে গেলো। তারা বললো, বুড়োটা আচ্ছা শয়তান —ছেলে নিশ্চয় প্রোটেসট্যাণ্ট সম্প্রদায় ছেড়ে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যোগ দিতে চেয়েছিলো আর সেই জন্যেই ওই প্রোটেস্-ট্যাণ্ট শয়তান বাপটা তাকে খুন করেছে। অতএব, পাদ্রিদের হুকুমে পুত্রহারা বৃদ্ধর উপর অসম্ভব নির্যাতন শুরু করা হলো—সে-নির্যাতন এমনই বীভৎস যে শেষ পর্যন্ত বুড়োটি মারা গেলো। আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে বুড়োর আত্মীয়স্বজনেরা ফ্যার্নে-তে ভোলতেয়ারের বাড়ি উপস্থিত।

— ভোলতেয়ার আমাদের বাঁচাও।

—ভোলতেয়ার, আমাদের আশ্রয় দাও।

ভোলতেয়ারের কাছে আশ্রয় চেয়ে কেউ কখনো ফিরে যায়নি।

তার কিছুদিন পরেই ভোলতেয়ার শুনলেন ওই তুলোঁ শহরেই ষোল বছর বয়সের একটি ছেলের মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। অপরাধ,—সে-নাকি যীশুখ্রীষ্টের মূর্তিকে অসম্মান করেছে। আরো অপরাধ,—তার ঘর খানাতল্লাস করে ভোলতেয়ারের লেখা এককপি 'দর্শনের অভিধান' খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ছেলেটির মৃতদেহ প্রকাশ্যভাবে দাহ করা হলো—ওই মৃতদেহের সঙ্গে ভোলতেয়ারের লেখা বইটিও।

ভোলতেয়ারের কাছে সে-খবরও এসে পৌঁছুলো।

রাগে থমথম করছেন ভোলতেয়ার। কে যেন এ-সময়ে ভোল-তেয়ারকে বলেছিলেন, বিদ্রূপের উপন্যাসে আবার হাত দিন।

ভোলতেয়ার বললেন, না ঠাট্টাবিদ্রূপের সময় আর নেই। রসিকতা এক, আর খুনের আয়োজন এক। দেশে খুনের আয়োজন চলেছে। তাই আর রসিকতার সময় নেই।

ভোলতেয়ারকে অমনভাবে গম্ভীর হয়ে যেতে জীবনে দেখা যায় নি। ভোলতেয়ার লিখছেন, এ-সময়টায় হাসতেও লজ্জা করতো—মুখে হাসি এলে মনে হতো অপরাধ করছি।

ভোলতেয়ার এবার কী লিখতে শুরু করবেন?

সাহিত্য? দর্শন? নাঃ, বড়ো বই আর নয়। ভোলতেয়ার বললেন, বড়ো বই লেখবার সময় গিয়েছে। এখন কাজের সময়। এই অনাচার আর অত্যাচারকে বন্ধ করবার জন্যে একটা কিছু করতে হবে। অন্য কিছু।

সত্তর বছরের উপর বয়েস হলো। ভোলতেয়ার বললেন, যুদ্ধে নামতে হবে।

সৈনিক হবে কে?

ভোলতেয়ারের সৈনিক হলো ছোটো পুস্তিকা। বড়ো বইয়ের সময় নয়। হাসিঠাট্টার সময় নয়। সাধারণ মানুষকে সজাগ করতে হবে। তারা না জাগলে এই অনাচার আর অত্যাচার বন্ধ হবে কী করে? অতএব তাদের মধ্যে প্রচার-কাজ চালাতে হবে। প্রচার-কাজ চালাবার জন্যে পুস্তিকার প্রয়োজন—বড়ো বই লিখে, বড়ো বইএর সাহায্যে সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে তোলা যায় না।

ভোলতেয়ার যেন এক পাগলের কাণ্ড শুরু করলেন। একের পর এক পুস্তিকা। অজস্র—অজস্র—পুস্তিকা। কোনোটা বা ভোলতেয়ারের নাম নিয়েই লেখা, কোনোটা বা আর-কোনো ছদ্মনামে। ছদ্মনামের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে একশো পেরিয়ে গেলো। একজন মানুষ যে একটানা এতো রকমের এতো তীক্ষ্ণ প্রচার-পুস্তিকা লিখে যেতে পারেন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে, মাসের পর মাস ধরে, এমন কি বছরের পর বছর ধরে—তা ভোলতেয়ারের আগে সত্যিই কল্পনার অতীত ছিলো!

যেন আগুনের টুকরো এক একটা। দাউ দাউ করে আগুন ধরে গেলো ফ্রান্সের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত।

অজস্র সংখ্যায় প্রচারিত হতে লাগলো পুস্তিকাগুলো। কোনো কোনোটা নাকি ৩০০,০০০ কপি পর্যন্ত বিক্রি হতে লাগলো।

বিশ্রাম নেই ভোলতেয়ারের।

বৃদ্ধ লোকটির মধ্যে শক্তির আর উৎসাহের যেন শেষ নেই। অথচ শরীরটা অপলকা,—রুগ্ন, দুর্বল। ভোলতেয়ার কোনো দিনই খুব সুস্থ-সবল ছিলেন না। তবু অদম্য প্রতিজ্ঞা ভোলতেয়ারের। শেষ বয়েসটায় তাঁর একমাত্র ভয়, দায়িত্ব শেষ করবার আগেই না মারা যেতে হয়!

দায়িত্ব বলতে কেবলমাত্র লেখাই নয়। লেখা তো বটেই। কিন্তু লেখা ছাড়াও অনেক কিছু।

লাঞ্ছিত মানুষেরা এসে বলে, ভোলতেয়ার আশ্রয় দাও।

আশ্রয় চেয়ে কেউই কখনো ভোলতেয়ারের কাছ থেকে ফিরে যায় নি।

—আমাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, ভোলতেয়ার এ-অন্যায়ের প্রতিকার করো।

অন্যায়ের কথা শুনেও প্রতিকার করবার চেষ্টা না করে ভোলতেয়ার কোনো দিনই স্থির থাকতে পারেন নি।

ফ্যার্নে-তে আশ্রিতদের ভিড় জমতে থাকে। ভোলতেয়ার শুধুই যে তাদের কথা লিখে প্রকাশ করে তাদের সাহায্য করেন তাই নয়, দুহাত উপুড় করে তাদের অর্থ সাহায্য করতে থাকেন।